সংবাদ

তারিখ 13 JUL 2005
পৃষ্ঠা ৬ ২

কেউ পাস না করা স্কুল-মাদ্রাসাগুলো

এবারও এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় ক'টি স্কুল ও মাদ্রাসা থেকে কেউই পরীক্ষায় পাস করেনি তার হিসাব দেয়া হয়েছে। এবার সংখ্যাটি ৪০৯। গত বছরের চেয়ে ১৫৮টি কম। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক স্কুল ও মাদ্রাসা থেকে ছাত্রছাত্রীর প্রথম পাবলিক পরীক্ষায় পাস না করার একটা ধারাবাহিকতা আছে। ২০০৩ সালে মোট ৬৪২, ২০০২ সালে ৫১২ এবং ২০০১ সালে ৪৭৪টি স্কুল ও মাদ্রাসা থেকে একজন পরীক্ষার্থীও পাস করেনি। এবারও দেখা যাচ্ছে, দেশে মাদ্রাসার সংখ্যা কম হওয়ার পরও শূন্য পাসের তালিকায় মাদ্রাসার পাল্লাই ভারি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কলঙ্ক।

এদিকে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরপর ৩ বছর ধরে পাসের হার শূন্য, সেসব প্রতিষ্ঠানের এমপিও (মাছুলি পেমেন্ট অর্ডার) বাতিল হচ্ছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া নাকি এতে সম্মতি দিয়েছেন। এ কারণে গত বছরও ৪২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করা হয়। এ বছর ক'টি স্কুল ও মাদ্রাসা এর শিকার হবে তা জানানো হয়নি। গত বছর যাদের এমপিও বাতিল করা হয়নি, তাদের 'কারণ দর্শাও' নোটিশ দেয়া হয়েছিল। এসব স্কুল-মাদ্রাসা মানসম্মত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কোন উদ্যোগের কথা শোনা যায়নি। তেমনি যেসব মাদ্রাসা ও স্কুল মানসম্মত করার অযোগ্য সেগুলো তুলে দেয়ারও ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অথচ মানহীন এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১২ জন শিক্ষক (মাদ্রাসায় ১৫ জন) ও ৩ জন কর্মচারীর জন্য প্রতি মাসে তাদের বেতনের ৯০ শতাংশ বাবদ ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। নতুন বেতন স্কেল বাস্তবায়িত হলে এ ব্যয় আরও বাড়বে। গত ৫ বছরে পাসের হার শূন্য এরকম ২ হাজার ৫১৮টি স্কুল ও মাদ্রাসা রয়েছে বলে একটি হিসাব পাওয়া যায়। প্রতিবারই পাসের হার শূন্য হলে স্কুল-মাদ্রাসাগুলোকে দু'বছর সময় বেঁধে দেয়া হয় এবং তার মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি না হলে এমপিও বাতিল করার হুমকি দেয়া হয়।

যেসব স্কুল ও মাদ্রাসার পাসের হার শূন্য তার প্রায় সবই গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। পাসের হার ১০ শতাংশের নিচে স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোও তাই। এদেরও কারণ দর্শাও নোটিশ দেয়া হয়েছিল। এসব স্কুল-মাদ্রাসার আর কোন খোঁজখবর কখনও করা হয় না। সাধারণত মনে করা হয়, সরকার থেকে বেতন আদায়ের উদ্দেশ্যে কতিপয় গ্রাম্য টাউট-বাটপার রাজনৈতিক স্বার্থে ও এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে মানহীন এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়ে সরকারের লাখ লাখ টাকা অনুদান নিচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও বোর্ডের একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার যোগসাজশে এবং রাজনৈতিক নেতাদের সহায়তায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি অনুদান লাভ করে। ভাল করে তদন্ত করলে এসব মানহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্মবৃত্তান্ত ও হালহকিকত ধরা পড়বে; কিন্তু প্রশ্ন হলো, কাজটি করবে কারা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ছত্রছায়ায় এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সরকারি শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের দ্বারা কি প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব?

দেশের যেসব স্কুল ও মাদ্রাসা থেকে কেউ পাস করেনি অথবা পাসের হার ১০ শতাংশের কম সেসব স্কুল-মাদ্রাসার এমপিও বন্ধ করে দিয়ে এগুলো বন্ধ করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়াটা সমস্যার একটা নেতিবাচক সমাধান হতে পারে; কিন্তু তাতে দেশের শিক্ষার আরও ক্ষতি হবে। গ্রামাঞ্চলের এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন থাকলে এবং 'ক্যাচমেন্ট' এলাকার শিক্ষার্থী থাকলে এগুলো বন্ধ না করে কিভাবে এদের মান উন্নত করা যায় সেদিকে নজর দেয়াটাই সমীচীন হবে। তাতে অনেক দরিদ্র পরিবারের সন্তান-সন্ততিরা লেখাপড়ার সুযোগ পাবে। মানহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা এবং এদের এমপিওভুক্তির জন্য উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তারাও অনেকটা দায়ী। উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় এমপি'র দায়-দায়িত্বও অবহেলা করার মতো নয়। বিশেষ ব্যবস্থার অধীন ২/৩ বছরের পরিকল্পনা নিয়ে মানহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মানসম্মত করার উদ্যোগ নিলে মেধাবী শিক্ষার্থীরাও এসব স্কুল-মাদ্রাসায় আসবে। আর যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই অথবা কাছাকাছি কোন স্কুল বা মাদ্রাসার সঙ্গে একীভূত করা সম্ভব সেগুলো তুলে দিলে সরকারের টাকা-পয়সা বেঁচে যাবে। মানহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে 'কঠোর ব্যবস্থা' সমস্যার সমাধান নয়। অন্যদিকে যেসব শিক্ষা কর্মকর্তা মানহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির জন্য দায়ী তাদেরও শনাক্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা প্রশাসন মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোর দুর্নীতির দৈন্যদশার জন্য কম দায়ী নয়।